নারী ও পুরুষ : কতিপয় ভ্রান্তি এবং ভ্রান্তিমোচন

শাহীন রহমান

নারী ও পুরুষ উভয়েই মানুষ, কিন্তু তারা একইভাবে বেড়ে ওঠে না। তাদের ভিন্ন ভিন্নভাবে গড়ে তোলা হয়। আর এক্ষেত্রে বৈষম্য বা ভেদাভেদ রয়েছে। এই অসমতা মেয়েদের দুর্বল, পরনির্ভরশীল, সংসারের বোঝা, অসহায়, সম্পদ ও সম্পত্তিহীন করে তোলে। এর বিপরীতে ছেলেরা হয় শক্ত-সবল, আত্মনির্ভরশীল, সমাজ-সংসারের কর্তা, আয় উপার্জনকারী বা ভরণপোষণকারী। এর ফলে পুরুষরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ, বড়ো ও মূল্যবান ভাবে। অন্যদিকে তা নারীদের ছোটো ও মূল্যহীন করে পুরুষের অধীনে ঠেলে দেয়। শুধু তাই নয়, সমাজ নারী ও পুরুষ সম্বন্ধে আরো কিছু ধারণা ছড়ায়। এসব ধারণা কেবল অবৈজ্ঞানিক ও ভুলই নয়, নারীবিরোধী শক্তিশালী অস্ত্রও। এসব মিথ্যা ধারণা নারীকে আরো দুর্বল করে, নারীর প্রতি বৈষম্য করতে পুরুষকে আরো মদদ দেয়। আর এসব প্রচলিত ভুল ধারণার অধিকাংশই হলো নারী ও পুরুষের দেহকে ঘিরে।

নারীর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো অপপ্রচার হলো— পুরুষের চেয়ে নারী দুর্বল। মেয়েদের শরীর পেশিবহুল নয় এবং তাদের শক্তি কম। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, এই ধারণা ভুল। এটা সত্যি যে, সন্তান জন্মদানের জন্য নারীর দৈহিক বৈশিষ্ট্য পুরুষের চেয়ে কিছুটা আলাদা। এজন্য নারীদের দেহের বাইরে ও ভিতরে কিছু আলাদা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে। কিন্তু নারীর দেহের এই বিশেষ কিছু ভিন্নতা বা বৈশিষ্ট্য তার দুর্বলতা নয়। মাতৃগর্ভে শিশুর জন্য প্রয়োজন খাদ্য ও পুষ্টি। আর এই খাদ্য ও পুষ্টি শিশু পায় নারীর দেহ থেকে। গর্ভের সন্তানের এই পুষ্টির যোগান দেয়ার জন্য নারীর দেহে চর্বি বা মেদ বেশি থাকে। সন্তান প্রসবের পর নারী তার নবজাতক সন্তানকে মাতৃদুগ্ধ পান করায়। নারীর এই মাতৃদুগ্ধ দানকারী অঙ্গ হলো স্তন। এটি পুরোপুরি চর্বি বা মেদ দ্বারা তৈরি একটি অঙ্গ। এসব কারণে নারীর দেহের পেশিগুলো পুরুষের পেশির মতো অতটা স্পষ্ট নয়। কিন্তু নারী ও পুরুষের দেহের হাড় ও পেশির সংখ্যা সমান। অন্যদিকে সন্তান পেটে ধরে রাখার জন্য নারীর কোমরের গঠন কিছুটা আলাদা। এছাড়া দেহের কিছু হাড়ের আকৃতি একটু ভিন্ন হয়। অর্থাৎ সন্তান উৎপাদনের জন্য নারীর দেহের মেদ বা চর্বি, হাড়, মাংসপেশি ইত্যাদির গঠন ও আকার-আয়তন পুরুষের চেয়ে খানিকটা আলাদা। সন্তান জন্মদানের জন্য কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছাড়া নারী ও পুরুষের দেহের সব উপাদান একই রকম। ফলে নারী ও পুরুষের দৈহিক গঠনে কিছু তারতম্য হয়। কিন্তু এই ভিন্নতা নারীর কোনো দুর্বলতা নয়। এছাড়া নারীরা হাজার বছর ধরে গৃহস্থালি কাজে যুক্ত। পুরুষের মতো ব্যায়াম বা শরীরচর্চা, সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানো, ফুটবল-ক্রিকেট খেলা— এসবের সুযোগ নারীরা পায় না বা পেলেও কম পায়। অনেক দিন তারা ক্ষেত-খামার ও কল-কারখানায় কাজ করতে পারে নি। সেজন্য নারীর দেহ তথা মাংসপেশির বিকাশ ব্যাহত হয়েছে। আবার শৈশব থেকে আমাদের দেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা কম পুষ্টি লাভ করে। এই ঘাটতির জন্য এ অঞ্চলের নারীরা দৈহিকভাবে কিছুটা দুর্বল হয়। এমনকি স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হবার কারণেও নারীদের মধ্যে দৈহিক দুর্বলতা দেখা যায়। সেই সঙ্গে ছোটোবেলাই মেয়েরা শোনে যে, তারা ছেলেদের তুলনায় দৈহিকভাবে দুর্বল। ফলে নিজের দেহ নিয়ে নারীরা অনেক সময় মানসিক দুর্বলতায় ভোগে। নিজ দেহের শক্তি সম্বন্ধে আস্থা হারায়। কিন্তু অনেক মেয়ে ব্যায়াম করে, কুস্তি লড়ে, মুষ্টিযোদ্ধা হয়, সাইকেল চালায়, সাঁতার কাটে, ক্রিকেট-ফুটবল-বাস্কেট বল খেলে। তারা মোটেই দৈহিকভাবে দুর্বল নয় বরং পুরুষের মতো শক্ত-সবল। এসব জুডো-কুংফু-কারাত-মুষ্টিযুদ্ধ ও জিমনেস্টিক-জানা নারী অনেক পুরুষকে কাবু করতে পারে। কিংবা সাঁতারু-দৌড়বিদ-অ্যাথলেট ও পাহাড়ে-চড়া নারীরা কখনোই দৈহিকভাবে দুর্বল হয় না। তাই আমরা দেখি শরীরচর্চাকারী, ক্রীড়াবিদ নারীদের দেহের পেশি অনেক সবল ও স্পষ্ট। দেশে বিদেশে এ ধরনের শক্ত-সবল নারী এখন আমরা অনেক দেখতে পাই। তাছাড়া ইউরোপ-আমেরিকা-আফ্রিকার নারীরা এ কারণে আমাদের দেশের নারীদের চেয়ে অনেক শক্ত-সবল। এখন আমাদের দেশের নারীরাও শক্ত-সবল হচ্ছে।

আবার শ্রমজীবী নারীরা অভাবের কারণে অনেক দৈহিক শ্রম দেয়। তাই তাদের পেশির বিকাশ ঘটে। তারা অনেক শক্ত-সবল হয়। উল্লেখ্য যে, শিক্ষিত বিত্তশালী নারীরা যথেষ্ট দৈহিক শ্রম না-করায় তাদের দৈহিক শক্তি শ্রমজীবী নারীদের চেয়ে কম থাকে। তবে পরিশ্রমের তুলনায় প্রয়োজনীয় খাদ্য-পুষ্টি শ্রমজীবী নারীরা পায় না। দৈহিক শ্রমের পাশাপাশি যথেষ্ট খাদ্য পেলে তারা আরো শক্ত-সমর্থ হতো। কিন্তু এই বৈষম্য সত্ত্বেও শ্রমজীবী নারীদের আমরা পুরুষের মতো সমান পরিশ্রম করতে দেখি; যেমন ইটভাঙা, মাটিকাটা, কৃষিকাজ করা নারী। তেমনিভাবে আদিবাসী, পাহাড়ি নারী ঘরে-বাইরে অনেক পুরুষের চাইতে বেশি পরিশ্রমের কাজ করে। তাই তারা দৈহিকভাবে দুর্বল, এটা কেউই বলবে না।

তাছাড়া শক্তি, সবলতা, ক্ষমতা দেহ থেকে আসে না। তাহলে তো ব্যায়ামগীর-কুস্তিগীর-মুষ্টিযোদ্ধা-কুংফু-কারাটেরা সমাজের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী-শক্তিশালী হতো। কিন্তু আমরা দেখি যে, সমাজে যারা সবচেয়ে শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান তারা দৈহিকভাবে তেমন শক্ত-সবল নয়। এমনকি অনেক দেশে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের মধ্যে নারীও রয়েছে। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, নারীর গর্ভ থেকেই তো সবল-শক্ত সব পুরুষ মানুষ জন্মায়। তাই যারা শক্ত-সবল মানুষ পয়দা করে, তারা দুর্বল হয় কীভাবে? তবে নারীর দৈহিক উচ্চতা ও পেশির ব্যবহার, কাঠামো পুরুষের সমান নয়। অবশ্য বিভিন্ন দেশে নারী-পুরুষের এই

তারতম্য একই হয় না। ইউরোপ-আমেরিকায় নারী-পুরুষের উচ্চতার মধ্যে তফাৎ অনেক কম। অথচ আমাদের দেশে নারীর চেয়ে পুরুষের উচ্চতা সাধারণত বেশ কম হয়। নারীর প্রতি দীর্ঘদিনের বৈষম্য এর কারণ। খাদ্য ও পুষ্টিতে ঘাটতি, দেহকে শক্ত-সবল করার সুযোগের অভাব ইত্যাদি কারণে নারীর উচ্চতা হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, দৈহিক কিছুটা ভিন্নতা কেবল নারী ও পুরুষের মধ্যে থাকে না। পুরুষে-পুরুষে কিংবা নারীতে-নারীতেও দৈহিক গঠনে তফাৎ থাকে কিছুটা। কিন্তু এই ভিন্নতা কোনো দৈহিক দুর্বলতার প্রমাণ হতে পারে না। কিংবা দেহের গঠনে কিছুটা কম-বেশি হলেই কেউ দুর্বল হয় না। লম্বা-চওড়া একজন মানুষকে জুডো-কুংফু জানা ছোটোখাটো একজন মানুষ সহজেই কুপোকাত করতে পারে। উল্লেখ্য যে, প্রাণিজগতে নারী-পুরুষের মধ্যে দেহগত সবলতা-দুর্বলতা নেই।

আর একটি বহুল প্রচারিত মিথ্যা হলো— মেয়েদের মাথায় ঘিলু বা মগজ কম। তাই তারা পুরুষের চেয়ে কম বুদ্ধিমান বা কম মেধাবী। এটাও একেবারে ভুল ধারণা। এটা ঠিক যে, মেয়েদের মাথার খুলির আকার সামান্য একটু ছোটো থাকে। এজন্য তাদের মাথায় মগজ পুরুষের চেয়ে খুব সামান্য কম হয়। কিন্তু মগজের এই সামান্য কম-বেশিতে বুদ্ধি বা মেধার কোনো তারতম্য ঘটে না। বরং মেধা ও বুদ্ধির কম-বেশি ঘটে মগজের চর্চায়। যে যত মস্তিষ্কের চর্চা করবে, সে তত মেধাবী ও বুদ্ধিমান হবে। এছাড়াও প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পুষ্টি, উপযুক্ত পরিবেশ, পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা— মেধা, বুদ্ধি, প্রতিভার বিকাশ ঘটায়। আবার বংশধারার মাধ্যমেও মেধা, প্রতিভা, বুদ্ধি মানুষের মধ্যে আসে। যেমন কোনো মানুষের প্রতিভা, মেধা, বুদ্ধি তার পরবর্তী প্রজন্ম কিছুটা পায়। অন্যদিকে আমরা অনেক বড়ো মাথার মানুষকে দেখি, যারা আদৌ মেধাবী, প্রতিভাবান বা বুদ্ধিমান নয়। তেমনি বিশ্বের অনেক প্রতিভাবান, জ্ঞানী, বিজ্ঞানীর মাথা ছোটো ছিল বা তাদের মাথায় মগজ কিছুটা কম ছিল। যেমন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, মহামতি লেনিন। হাতির মাথার মগজ ডলফিনের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাতির চেয়ে ডলফিন অনেক বেশি বুদ্ধিমান। তাই নারীর মাথার খুলি ও মগজের আয়তন সামান্য কিছু কম বলে নারীর বুদ্ধি-মেধা-প্রতিভা কম নয়। বরং আমরা ইতিহাসে অনেক মেধাবী, প্রতিভাবান ও জ্ঞানী নারীর দেখা পাই। তেমনি বর্তমানে অসংখ্য নারী জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিল্প-সাহিত্যে তাদের মেধা ও প্রতিভার প্রমাণ রেখেছেন। নোবেল পুরস্কার ছিনিয়ে নিয়েছেন। সারা বিশ্ব আজ এসব নারীর বুদ্ধি, মেধা ও প্রতিভার স্বীকৃতি দিচ্ছে। তাছাড়া সমাজ সব সময় প্রচার করে যে, মেয়েদের বুদ্ধি, মেধা, প্রতিভা কম। আর এই প্রবল প্রচারণার ফলে মেয়েরা জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য তথা মেধার চর্চা করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। অন্যদিকে নারীদের তার বুদ্ধি, প্রতিভা ও মেধার চর্চা করার পর্যাপ্ত সুযোগ দেয়া হয় না। বর্তমানে অবশ্য নারীরা এক্ষেত্রে কিছুটা সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু এখনো এই সুযোগ খুবই সীমিত। তাই এসব কারণে মেধাবী, বুদ্ধিমান, প্রতিভাবান নারীর সংখ্যা আমরা সমাজে কম দেখি। কিন্তু একদিন অবশ্যই সুযোগের সমতা আসবে। তখন মেধাবী, বুদ্ধিমান, প্রতিভাবান নারীর সংখ্যা আরো অনেক বৃদ্ধি পাবে। আর সেদিন নারীর বুদ্ধি, মেধা কম— এই অপপ্রচার বন্ধ হবে।

অনেক সময় বিজ্ঞানের নামে ভুল ধারণা ছড়ানো হয়। যেমন অনেকে বলে যে, পুরুষের দেহে বিশেষ হরমোন (testosterone) বেশি থাকে। এই পুরুষ হরমোনের কারণে পুরুষালি বৈশিষ্ট্যের হয় পুরুষরা। আগ্রাসী, নিষ্ঠুর, নির্যাতনকারী, বহু নারীর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে দেখা যায়। তেমনি মেয়ে হরমোনের (Estrogen, Progesterone) জন্য মেয়েরা লাজুক, মমতাময়ী, নম্র ও ধৈর্যশীল হয়। কিন্তু এইসব ব্যাখ্যা একেবারেই মিথ্যা। এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তাছাড়া অনেক পুরুষের স্বভাব এরকম নয়। অনেক নারীও এ ধরনের হয় না। আসল সত্য হলো— দেহের কোনো উপাদান নয় বরং সমাজ নারী ও পুরুষকে ওইরকমভাবে গড়ে তোলে। আর নারী ও পুরুষের এ ধরনের স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করা যায়।

মেয়েরা বেশি কাঁদে বা চোখের জল ফেলে, এই ধারণাও ঠিক নয়। কেননা চোখের কোণে অবস্থিত একটি বিশেষ গ্রন্থি (Lacrimal gland) চোখের জল তৈরি করে। এই অঙ্গটি নারী ও পুরুষের একই রকম বা সমান। অর্থাৎ নারীর চোখে জল বেশি থাকে না। বরং নারী ও পুরুষের চোখে জল সমানই থাকে। তাই নারীর বেশি কান্নাকাটি করার কারণ এটা নয়। আসলে কান্না মনের একটি আবেগ। এই আবেগ সৃষ্টি হলে কান্না আসে এবং তখন চোখ দিয়ে পানি পড়ে। ছোটোবেলা থেকে মেয়েদের এই আবেগ প্রকাশ করতে বলা হয়। অর্থাৎ তারা বেশি কাঁদার শিক্ষা পায়। আর অন্যদিকে পুরুষরা এই আবেগ দমন করতে শেখে। তাই তারা কম কাঁদে। এটাই হলো মেয়েদের বেশি কাঁদা এবং পুরুষের কম কাঁদার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, দৈহিক কারণে জন্ম থেকে মেয়েদের বেঁচে থাকা বা টিকে থাকার সামর্থ্য পুরুষের চাইতে বেশি। সেজন্য প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নারীরা পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি টিকে থাকতে সক্ষম। ফলে নারীর গড়আয়ু বেশি হয়। এমনকি মানুষের দেহে শক্তি বা জ্বালানি উৎপাদনকারী কোষের উপাদান (Mitrochondria) মায়ের দেহ থেকে আসে। কিন্তু নারীর প্রতি নানা সামাজিক বৈষম্যের কারণে নারীরা পুরুষের চেয়ে কম বাঁচে।

আমরা প্রায়ই শুনি যে, নারী ও পুরুষের মস্তিষ্কের ক্ষমতা আলাদা। মেয়েদের মস্তিষ্কে আবেগ সৃষ্টির উপাদান বেশি। তাই মেয়েদের আবেগ বেশি। অঙ্ক করার, যুক্তিবাদী হওয়ার ক্ষমতা মেয়েদের মস্তিষ্কে কম। অন্যদিকে পুরুষের মস্তিষ্কে অঙ্ক করা বা যুক্তিপ্রবণ হবার ক্ষমতা বেশি থাকে। সেজন্য মেয়েদের চাইতে পুরুষরা বেশি যুক্তিবাদী হয়। তাদের অঙ্কচর্চা করার ক্ষমতা

বেশি। নারী ও পুরুষ বিভিন্ন ঘটনায় ভিন্নভাবে সাড়া দেয়। ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। কিন্তু এসব ধারণার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। এগুলো ভুল ধারণা। আসলে মানুষের মস্তিষ্ক সম্বন্ধে মানুষ এখনো পুরোপুরি জ্ঞান লাভ করতে পারে নি। এখনো জানার চেষ্টা চলছে। তবে মস্তিষ্ক সম্বন্ধে মানুষ অনেক কিছু ইতোমধ্যে জেনেছে। ফলে নারী ও পুরুষের মস্তিষ্ক আলাদা আলাদা এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখা গেছে। কিন্তু সেটা খুবই নগণ্য। তাতে নারী ও পুরুষের মস্তিষ্কের ক্ষমতার কোনো তফাৎ ঘটে না। যুক্তিবাদী হওয়া, অঙ্ক করার ক্ষমতা, আবেগ প্রকাশ, প্রতিক্রিয়া জানানো, কোনো ঘটনায় সাড়া দেয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য হওয়ার কোনো কারণ নেই। সমাজ ভিন্ন ভিন্নভাবে নারী ও পুরুষের দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ঘটায়। তাই তাদের মস্তিষ্কের ক্ষমতার কিছুটা তারতম্য দেখা যায়। একই রকমভাবে নারী ও পুরুষকে গড়ে তোলা হলে মস্তিষ্কের এই সামান্য তফাৎ আর থাকবে না।

প্রজনন নিয়ে নানা কুসংস্কার

প্রজনন বা সন্তান জন্মদান দেহের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। তবে প্রজননক্ষমতাকে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছে। অন্যান্য প্রাণীর এই ক্ষমতা নেই। প্রজনন নিয়ে আমাদের সমাজে এখনো নানা ভুল ধারণা ও কুসংস্কার রয়েছে। প্রজননে নারীর ভূমিকা অনেক বেশি থাকে। তাই এই কুসংস্কার ও ভুল ধারণার দ্বারা নারীরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সবাই সন্তান চায়। তবে অবশ্যই এই সন্তান নিজ গর্ভের হতে হবে। নিজের ঔরসজাত সন্তান না-হলে চলবে না। অর্থাৎ সবাই আমরা দৈহিকভাবে বা জৈবিকভাবে মাতা-পিতা হতে চাই। অন্য কোনোভাবে বাবা-মা হওয়াটা আমরা পছন্দ করি না। এই মনোভাবের জন্য সমাজ-সংসারে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে অনেক দম্পতির সন্তান হয় না। এই সমস্যার জন্য পুরুষ ততটা বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে না। কিন্তু এই অক্ষমতার জন্য নারীরা পরিবারে, সমাজে মুখ দেখাতে পর্যন্ত পারে না। অথচ এখন ডাক্তারি পরীক্ষায় এই সমস্যার কারণ বের করা যায়। অনেক সময় এই সমস্যার সমাধান করাও সম্ভব। তা সত্ত্বেও দেখা যায়, পুরুষরা এই জন্য ডাক্তারি পরীক্ষা করতে চায় না। নিজের অক্ষমতা প্রকাশ হবার ভয় পায়। এমনকি সন্তানদানে তাদের অক্ষমতা প্রকাশিত হলেও বেশিরভাগ সময় তা গোপন রাখে। এই অক্ষমতার জন্য উলটো বউকে দোষ দেয়। এমনকি পুনরায় বিয়ে করে। এভাবে অপরাধ না-করেও নারীরা সাজা পায়। বিপরীতে প্রজনন-অক্ষমতার জন্য নারীকে বারবার পরীক্ষা করা হয়। আর তার অক্ষমতা প্রমাণিত হলে তাকে অপরাধী করে পরিবার ও সমাজ। এজন্য নানা অপবাদ, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা শুনতে সে বাধ্য হয়। এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তালাক পর্যন্ত ঘটে। তবে কোনোভাবে পুরুষের প্রজনন-অক্ষমতা প্রমাণিত হলে নারীদের কিছু করার থাকে না। নপুংশক স্বামীকে তালাক দিয়ে সে আবার বিয়ে করতে পারে না। বরং নীরবে এটা মেনে নেয়।

কিন্তু এখন বিজ্ঞানের অনেক অগ্রগতি ঘটেছে। তাই আজ নানাভাবে প্রজননসমস্যার সমাধান করা যায়। কোনো নারীর প্রজননসমস্যা থাকলে বর্তমানে নানা চিকিৎসা দ্বারা সে মা হতে পারে। যেমন টেস্টটিউব পদ্ধতি ব্যবহার করে আজকাল অনেকে মা হচ্ছে। অবশ্য এটা অনেক ব্যয়সাপেক্ষ। এমনকি ডিম্বাশয় বা ডিম্বাণুর কোনো সমস্যা হলে অন্য নারীর কাছ থেকে ডিম্বাণু নেয়া সম্ভব। অন্য নারীর ডিম্বাণু নিয়ে একজন নারী মা হতে পারে। একজন সক্ষম নারীর জরায়ুতে বিশেষ পদ্ধতিতে পুরুষের শুক্রাণু ও নারীর ডিম্বাণু ঢুকানো হয়। এভাবে সেই নারী গর্ভধারণের পর সন্তান জন্ম দেয়। তারপর বন্ধ্যা নারীটি ওই বাচ্চা গ্রহণ করে। অবশ্য আসল মা অর্থের বিনিময়ে বা এমনি এ কাজটি করতে পারে। তেমনি কোনো পুরুষ সন্তান জন্মদানে অক্ষম হলে, তার পক্ষেও বাবা হওয়া সম্ভব। যেমন নিজের স্ত্রীর গর্ভে অন্য পুরুষের শুক্রকীট যন্ত্রের দ্বারা স্থাপন করে গর্ভধারণ করা। এভাবে একজন বন্ধ্যা পুরুষের স্ত্রী সন্তান জন্মদান করতে পারে। আবার নিঃসন্তান দম্পতির পক্ষে আজকাল সহজেই সন্তান দত্তক নেয়া সম্ভব।

কিন্তু এভাবে প্রজনন-অক্ষমতা বা সমস্যার সমাধান করতে হলে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দরকার। কারণ অনেক নারী-পুরুষের আজ প্রজনন-অক্ষমতা চিকিৎসা করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু তারা কতগুলো ভুল ধারণা বা সংস্কারের জন্য চিকিৎসা করে না। এক্ষেত্রে প্রথমেই নিজের রক্তের সন্তান, নিজের ঔরসজাত সন্তান, নিজের গর্ভের সন্তান এসব সংস্কার ত্যাগ করতে হবে। কেবল দৈহিকভাবে বাবা-মা হলে চলবে না, সেই সঙ্গে সামাজিকভাবে বাবা-মা হবার মানসিকতা অর্জন করা দরকার। কেননা যেভাবেই সন্তান হোক না কেন, সেই সন্তানের বাবা-মা হতে আপত্তি থাকার কোনো কারণ নেই।

আবার আজকাল গর্ভের সন্তান পরীক্ষা করে সন্তান ছেলে-না-মেয়ে হবে তা জানা যায়। অনেক দেশে এটা জানার পর গর্ভের কন্যাভ্রূণকে মেরে ফেলা হয়। পুত্রসন্তানের জন্য এটা করে মানুষ। অনেক সময় মেয়েশিশু জন্ম নিলে আমরা মাকে দোষ দেই। কিন্তু এটা একেবারে ভুল ও অন্যায়। কারণ সন্তান ছেলে-না-মেয়ে হবে তাতে মায়ের কোনো হাত নেই। বরং বাবার শুক্রাণুর ভেতরের ক্রোমোজম নামক পদার্থ ঠিক করে দেয় মায়ের গর্ভের ভ্রূণ ছেলে-না-মেয়ে হবে। তাই মেয়েসন্তান বা ছেলেসন্তান যাই হোক না কেন, তা বাবার কারণে হয়। তাই প্রজনন নিয়ে বিভিন্ন ধরনের অযৌক্তিক সংস্কার আজ ত্যাগ করার সময় এসেছে।

শাহীন রহমান জেন্ডার বিশেষজ্ঞ। বামধারার রাজনৈতিক কর্মী। ০১৭১৫০১৭৪০১